সরস্বতী নিকটবর্ত্তী কচুজোড় গ্রামের জমিদার রাজা রুদ্রচরণ রায়ের সভাসদ ছিলেন। শুনিয়াছি সরস্বতী মহাশয়ের সঙ্গে স্বর্ণলালীর ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এই সম্বন্ধ সহোদর সম্পর্কিত কি না নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। রাজা রুদ্রচরণের গুরুদেব সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা 'যাদবেন্দ্র' বা 'যাদবিন্দ' স্বর্ণলালীর পাণিগ্রহণ করেন। উপযুক্ত পতির সাহচর্য্যে এই কবিত্বশালিনী নারী আপনার শক্তির অনুশীলনে যথাযথ সহায়তা পাইয়াছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়।

স্বর্ণলালী, মঞ্জুলালী প্রভৃতি নাম বীরভূমে তথা পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থানে আজিও প্রচলিত আছে। ব্রজভাষায় বালককে যেমন আদর করিয়া লাল বা লালা বলে, বালিকাকে তেমনি লালী বলে। দুলালীর সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ আছে কি না, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা বলিতে পারেন।

রাজা রুদ্রচরণ সামান্য জমিদার ছিলেন, স্থানীয় লোকে তাঁহাকে রাজা বলিত। তবে সেকালের প্রথা অনুসারে ইঁহার আবাসবাটী পরিখা-প্রাকার পরিবেষ্টিত ছিল, নিজের সৈন্য ও সেনাপতি ছিল। লোকে ইঁহাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া মনে করিত। রাজার কুলদেবী কচ্চিকার পাষাণ-বেদিকা কচুজোড়ের গড়ের (রাজা বেড়ার) ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আজিও বিদ্যমান আছে। দেবীর কোনো মূর্ত্তি নাই। যাদবিন্দ বা যাদবেন্দ্র ইঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। রাজা পরে এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজা বালগোপাল মন্ত্রের উপাসক এবং গোপাল বিগ্রহের সেবক ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে ধাতুময়ী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি দান করেন। রাজা মহা সমারোহে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তদবধি নিজেই তাহার সেবা-পূজায় নিযুক্ত হন। রাজার প্রতিষ্ঠিতা এই দেবী এবং তাঁহার তান্ত্রিক সাধনার সিদ্ধিস্থান আজিও লোকের নিকট পূজা পাইতেছে। প্রজা সাধারণের কৃষি-কার্য্যের সুবিধার জন্য রাজা আনাজোলার বাঁধ নামে একটী সুবৃহৎ জলাধার প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই বাঁধের সঙ্গে গড়ের জলাশয়গুলির যোগ ছিল, এবং মধ্যবর্ত্তী নালার সাহায্যে পার্শ্ববর্ত্তী শস্যক্ষেত্র-সমূহে জল সেচনের যথেষ্ট সুব্যবস্থা ছিল। প্রবাদ আছে, এই বাঁধ প্রতিষ্ঠার উৎসবে পুষ্কর-মেগ ব্রাহ্মণ বেশে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই প্রবাদ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, বাঁধের জলে প্রজা সাধারণের কৃষি-কার্য্যের কিরূপ সুবিধা হইত। পুষ্কর বর দিয়াছিলেন, আমার অধিকারেও রাজার প্রজাগণকে অনাবৃষ্টি অজন্মার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। অর্থাৎ আমাজোলার জলের প্রাচুর্য্যে "পুষ্করে দুষ্করো বারি" প্রবচনও অর্থহীন প্রতিপন্ন হইবে। এই বাঁধ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর কৃপায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া মজিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে। রেলপথের অনিষ্ট হইবে বলিয়া রেল কোম্পানী সর্ব্বদাই বাঁধ কাটিয়া রাখেন, সুতরাং বাঁধের জলে গ্রামের পুষ্করিণী ভরিয়া লইবার বা ক্ষেতে জল সেচিবার যে সুবিধা ছিল তাহাও আর নাই। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে আসিয়া বণিকের দল বীরভূমের অনেক গ্রামেরই এই রূপ উপকার করিয়াছেন। (অণ্ডাল সাঁইথিয়া) "শাখা" রেলপথেই এত, না জানি "কাণ্ড" রেলপথে কি কাণ্ড কারখানাই না হইয়াছে!

স্বর্ণলালী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

বীরভূমের সদর সিউড়ি হইতে কম-বেশী দুই ক্রোশ দূরে মল্লিকপুর গ্রাম। বীরভূমে মল্লিকপুরের সে কালে খুব প্রসিদ্ধি ছিল। সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাসভূমি বলিয়া আজও এই গ্রামের নাম আছে! মহিলা কবি স্বর্ণলালী দেবী এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। মল্লিকপুরের সর্ব্বানন্দ

জলধর সেন সম্পাদিত, "ভারতবর্ষ" পত্রিকার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় (আগস্ট ১৯২৯) প্রকাশিত, স্বর্ণলালী প্রবন্ধ।

সৌজন্যে www.milansagar.com

বর্গীর হাঙ্গামায় রাজা হত হন,—মারাঠা ভাস্কর পণ্ডিত রাজাকে হত্যা করেন। এ সম্বন্ধে একটী ছড়া আছে—

যাদবিন্দ সর্ব্বানন্দ। মল্লশরণ রামভদ্র॥
আর কচ্চিকাচরণ। পাঁচে রুদ্রচরণ॥
বর্গীরে হলেন সদয়া, রুদ্রে হলেন বৈমুখী।
ভাস্কর কল্লে ব্রহ্মহত্যা, কাঁদলো গাছপালা পশুপক্ষী॥

বাঙ্গালা সন ১১৪৯ সালে বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। বাঙ্গালার মসনদে তখন প্রবল আলিবর্দ্দী নবাবী করিতেছিলেন। তিনি বর্গীদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। বর্গীর দল বিষ্ণুপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া বীরভূম বর্দ্ধমানে ছড়াইয়া পড়ে। এতদঞ্চলের বহু জমিদার সম্মুখ যুদ্ধে বর্গীদের বাধা দিয়াছিলেন। বীরভূমের কয়েকজন জমিদারের এইরূপ বাধা প্রদানের ফলেই রাজধানী রাজনগর আক্রান্ত হয় নাই। ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে রুদ্রচরণের যেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থান আজিও সংগ্রামপুর নামে পরিচিত। অনুমান হয় ১১৫০ সালে রাজা রুদ্রচরণের মৃত্যু হইয়াছিল। একখানি সনন্দ হইতে রাজা রুদ্রচরণের সময় আন্দাজ করিতে পারা যায়। সনন্দখানি রুদ্রচরণের পৌত্র প্রেমনারায়ণ রায়ের দাতব্য পত্র; নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

দাতব্য পত্র

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য ওলদে ৺দেবীচরণ ভট্টাচার্য্য, ইবনে ৺যাদবিন্দ ভট্টাচার্য্য শ্রীচরণ কোমলেষু—

লিখিতং শ্রীপ্রেমনারায়ণ রায়, ওলদে ৺দর্পনারায়ণ রায়, ইবনে রুদ্রচরণ রায় সাং ঈশানপুর

কস্য দাতব্য পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগণে জঙ্গলজাল সামিল মৌজে আড়াডাঙ্গালী ও লখড়িহিতে আমার পৈত্রিক জলদান বিত্তি আছে, নবশাখ লোক সকলে পিতৃরি মাতৃরি ও অন্যান্য কৃয়াদিতে ৺দানাদি করে তন্মধ্যে জলদান পাওনা আমার বিধি আছে, বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি পরং মৌজে আড়াডাঙ্গালীতে গ্রামের উত্তর শ্রীশ্রী৺ঠাকুর ঈশান কোনে লাগাও কড়ডাঙ্গ নামক এক পুষ্করিণ আন্দাজ ৪ বিঘা ঐ পুষ্করিণ পূর্ব্ব ঈশান লাগাও নয়াপুষ্করিণ নামক এক পুষ্করিণ ৩ বিঘা আমার পৈত্রিক স্বত্বাদ আছে এবং শ্রী৺ মন্দিরও আমার পৈত্রিক নিজ ভদ্রাসন বাটস্থ বাটী আন্দাজ ৭ বিঘা যাহাতে আমার পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল এবং শ্রী৺ মন্দির প্রস্তুত আছে আমি বহুকাল হইতে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি এক্ষণে আপনি আমার ইষ্ট দেবতা এ প্রযুক্ত আমি উক্ত বিষয় সকলের আপন স্বত্ব ত্যাগ করিয়া মহাশয়কে দান করিলাম আপনি উক্ত বস্তু সকলের দান বিক্রয়ের সত্বাধিকারি হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তদরূপাত করিবেন ইহাতে কাল কালো আমার কিম্বা আমার ওয়ারিশানের কোনো দাবী দাওয়া নাই যদি করি কিম্বা করে সে বাতিল ও মিথ্যা এতদর্থে আপন সেৎসা পূর্ব্বক হুস বহাল তবিয়তে সুস্থ শরীরে দান করিয়া এই দানপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২২৫ সাল তারিখ ২২ ফাল্গুন

বর্গীর হাঙ্গামায় রুদ্রচরণ হত হইলে পুত্র দর্পনারায়ণ ঈশানপুরে পলাইয়া যান। তাঁহারই পুত্র প্রেমনারায়ণ কুলগুরু যাদবিন্দের পৌত্র জগদীশ্বরকে দানপত্র লিখিয়া দিতেছেন। রুদ্রচরণ ব্রাহ্মণ ভূস্বামী বলিয়া এতদঞ্চলের শূদ্র প্রজাগণের ক্রিয়াকাণ্ডে প্রদত্ত জলদানের অধিকারী ছিলেন। দূর হইতে এ সমস্ত আদায় করার অসুবিধার জন্যই হউক অথবা শ্রদ্ধাবশতঃই হউক প্রেমনারায়ণ সে অধিকার গুরুকে দান করেন। এই দানপত্রের হিসাবে রুদ্রচরণ এবং তাঁহার গুরু যাদবিন্দকে সন ১১৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে পাওয়া যাইতেছে।

রুদ্রচরণের পরলোক গমনের অল্প দিন পরেই যাদবিন্দও পরলোকগত হন। বর্গীর হাঙ্গামায় তাহারও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছিল। যাদবিন্দের পুত্র দেবীচরণ লক্ষ্মী-জনার্দ্দন শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া সন ১১৬৬ সালে রাজনগর মুসলমান রাজদরবারে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়- বর্গীর হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, অথবা রাজা রুদ্রচরণের মৃত্যুতে আশ্রয়হীন হইয়া ইঁহারা কিরূপ অভাবে পড়িয়াছিলেন। এই সনন্দ হইতে আর একটী বিষয় জানা যায় যে, সন ১১৬৬ সালের পূর্ব্বে যাদবিন্দ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সনন্দখানিরও প্রতিলিপি দিলাম।

হুকুম শ্রীযুত রাজাসাহেব বাহাদুর লক্ষ্মীজনার্দ্দনের—

ইং গোবিন্দরাম শিকদার পরগণে জঙ্গলজাল সুচরিতেষু আগে সাং হরিষপুরের শ্রীদেবীচরণ ভট্টাচার্য্য জাহির করিলেক যে ৺ঠাকুরের সেবা প্রকাশ করিয়াছি সেবা পূজা চলেনা মৌজে হরিষপুরের ডাঙ্গালে ৺ধর্ম্মতালা বঞ্জর পতিত ৭ বিঘা ও সংগ্রামপুরের বক্সিবাদের পূর্ব্ব জঙ্গল পতিত ১২ বিঘা হামগী ১৯ বিঘা দেবত্তর হুকুম হয় তবে তৈয়ার ও আবাদ করিয়া সেবা পূজার খরচ করি অতএব সেবা পূজার কারণ মৌজে হরিষপুরের ডাঙ্গালে ৺ধর্ম্মতালার বঞ্জর পতিত ৭ বিঘা ও মৌজে সংগ্রামপুরের বক্সিবাদের পূর্ব্ব জঙ্গল পতিত ১২ বিঘা হামগী ১৯ উনিশ বিঘা দেবত্তর হুকুম করিয়া নিষ্কর করিয়া দিই জেন ভট্টাচার্য্য মজকুর জমি তৈয়ার ও আবাদ করিয়া সেবা পূজার খরচ করিতে থাকে ইতি সন ১১৬৬ সাল তা ১৫ বৈশাখ।

হরিষপুর কচুজোড়ের নিকটবর্ত্তী একটী পল্লী। এই পল্লী এখন বসতিশূন্য। যাদবিন্দের বংশধরগণ সম্প্রতি সংগ্রামপুরে বাস করিতেছেন। এই বংশে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমান ভোলাপদ কাব্যতীর্থ বর্ত্তমান আছেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া অধ্যাপনায় ব্রতী হইয়াছেন।

যাদবিন্দ ধর্ম্মে বৈষ্ণব ছিলেন কি না ঠিক জানা যায় না। তাঁহার বংশধরগণ তো নিজেদের শাক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যাদবিন্দ যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন তিনি প্রকৃত কবি ছিলেন, তাঁহার পদগুলি বাস্তবিকই বড় সুন্দর। যাদবিন্দের গোষ্ঠগানের প্রসিদ্ধি বহুজনবিদিত। তাঁহার মধুররসাত্মক পদগুলিও চমৎকার।

যাদবিন্দের একটী গোষ্ঠের পদ—

গহন-গমন কালে ভাসি নয়নের জলে
হরি মুখ করি নিরীক্ষণ

সৌজন্যে www.milansagar.com

ভারতবর্ষ পত্রিকার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় (আগস্ট ১৯২৯) প্রকাশিত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "স্বর্গলালী" প্রবন্ধ।

বলরামের করে ধরি সমর্পণ করি হরি
পুন রাণী কহেন বচন
আমার শপতি লাগে না যাইহ কারু আগে
তুমি মোর প্রাণ নীলমণি
নিকটে রাখিহ ধেনু বাজায়ে মোহন বেণু
ঘরে বসি যেন রব শুনি
বলাই সভার আগে আর শিশু পাশ্বভাগে
শ্রীদাম সুদাম যাবে পাছে
তুমি সভার মাঝে যাবে কারু আগে না ধাইবে
বনে বড় রিপু ভয় আছে
ধীরে পদ বাড়াইও পথ পানে চেয়ে যেও
তৃণাঙ্কুর অতিশয় পথে
কার বোলে বড় ধেনু ফিরাতে না যেও কানু
হাত তুলি দেহ মায়ের মাথে
রোদ্দুর লাগিলে গায় বসিও তরুর ছায়
বসন ভিজায়ে দিও গায়
যাদবিন্দ সঙ্গে লেহ বাধা পথে হাতে দেহ
সময় বুঝে দিবে রাঙ্গা পায়

যাদবিন্দ বহু পদে এই ভাবে নিজের দাস্যাভিমান প্রকাশ করিয়াছেন। কচিৎ কোনো পদে সৌখ্যভাবের আভাস পাওয়া যায়। স্বর্ণলালীর তিনটী পদের প্রত্যেকটাতেই কিন্তু সখীভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে ; স্বর্ণলালী নিজেকে বৃন্দারূপে পরিচিতা করিয়াছেন। স্বর্ণলালীর তিনটী পদই তুলিয়া দিলাম। (১ম) রূপানুরাগ—

অসকালে গেলাম যমুনার কূলে
বঁধুরে হেরিলাম নীপ তরুমূলে
দলিতাঞ্জন চিকণ রূপ
আমরি মরি রসের কূপ
কেনে সে রূপে সখি দিলাম আঁখি
নয়ন মন মোর হইল পাখী
উড়িয়া বসিলাম সে রস কূপে
আঁখি প্রাণ মোর হারাইল রূপে
নবীন মেঘেতে বিদ্যুৎ ছটা
হস্তে পদে দেখি চাঁদের ঘটা
মুখখানি দেখিলাম পুণিমের চাঁদ
যুবতীর মন নয়ন ফাঁদ
ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়ে আছে
পাঁজর কাটিয়া হৃদয়ে নাচে
মন মুরুছি মরিয়াছিল
কাঁখের কলসী খসিয়া গেল
অস্থির ঘরেতে আসিতে নারি
আঁধুলা হইয়া পথেতে ফিরি
কেহ সঙ্গে নাই মাত্র একাকি
অসকাল হইল করিব কি
অনুসারে যদি আইলাম ঘরে
কলসী না দেখি ভৎর্সন করে
গেহ হইল মোর দুর্গম বন
কি করি সখি ঘরে না রহে মন
দুগম বনেতে সব জন্তু রয়
গেহবনে মোর গুরুজনার ভয়
সে কালা বিনে মোর প্রাণ না রহে
ফুকারি কহিতে অন্তরে ভয়ে
স্বর্ণলালী কহে শোনহে ধনি
কানুর প্রেমে তুমি হও শিরোমণি
চল অভিসারে রাজারি বালা
যতনে আনিয়া মিলাইব কালা

এই একটী মাত্র কবিতা হইতেই স্বর্ণলালীর কবিত্ব অনুভূত হইতে পারে। কবিতাটীর প্রকাশ-ভঙ্গীতে এমন একটী চির-পরিচিত সুর কাণে বাজে যাহা বাঙ্গালারই নিজস্ব। ইহার ছন্দে এবং কথায় রমণী-হৃদয়ের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। কবিতায় বেদনা ব্যাকুলতা এবং সহানুভূতি যেমন প্রগাঢ় তেমনি স্বাভাবিক। কবিতার কোনো কোনো ছত্রে সেকালের গ্রাম্য গাথার অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনার কথা মনে পড়ে। মনে হয়, কবি আমাদের সম্মুখে বসিয়া ভাব-বিহ্বল প্রাণে, লয়-বিলম্বিত কণ্ঠে কবিতাটীর আবৃত্তি করিতেছেন। যেন সেকালের একটী স্বপ্নচিত্র ! সখি কেন সে রূপে আঁখি দিলাম, মনোপাখী নয়নময় হইয়া উড়িয়া গিয়া সে রূপের কূপে বসিল। আঁখি প্রাণ দুই-ই হারাইলাম। সে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মনে হইল—আমার পাঁজর কাটিয়া হৃদয়ে পশিয়া নাচিতেছে। তাহার দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা আমার প্রাণে এমনই তরঙ্গ তুলিয়াছে। মন মূর্চ্ছিত হৈল, কাঁখের কলসী খসিয়া পড়িল। নয়ন ফিরিল না, পথ হারাইলাম, অন্ধের মত পথে পথে ঘুরিতে লাগিলাম। কুলবধূর স্বভাব অনুসারে ঘরে ফিরিলাম বটে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা বন আমার পক্ষে ভাল ছিল। কালা বিনে যে আমি প্রাণে বাঁচিব না, এ কথা ফুকারি বলিবারও সেখানে উপায় নাই, সে গেহ দুর্গম বন নয় তো আর কি ? স্বর্ণলালী বলিতেছেন—রাজবালা অভিসারে চল কালাকে আনিয়া মিলাইয়া দিব।

ইহার পরের পদটী অভিসারের—

এখানে সেখানে একই দেখি
যুগল পীরিতির এই সে সাখী
উঠিয়া চলহ অভিসারে যাই
শুনি ধনী উৎকণ্ঠায় ধাই
দুই সখী দুই পাশেতে রয়
প্রেম অনুরাগে চলিয়া যায়

সৌজন্যে www.milansagar.com
সৌজন্যে www.milansagar.com
অলকা সেন সম্পাদিত, "ভারতবর্ষ" পত্রিকার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় (অগাস্ট ১৯২৯) প্রকাশিত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলালী" প্রবন্ধ।

কতদূরে যেয়ে পাইল বৃন্দাবন
নয়ানে দেখিল কৃষ্ণ প্রাণধন
মন্দির দ্বারেতে দাঁড়াইল কিশোরী
শ্যামচাঁদ উঠিয়া আইল আগুসারি
আহা মরি মরি প্যারী আইল
বিষময় তনু অমৃত হইল
তবে শ্যাম নিলেন করেতে ধরি
ধরি বসাইলা পালঙ্কোপরি
নিজবাসে দুটী চরণ ঝারে
কত আলিঙ্গন চুম্বন করে
মনের বিরহ গেল সব দূরে
হাসিয়া বসিলা বঁধুর কোড়ে
বঁধুর অঙ্গে হেলান দিল
দোঁহ তনু দোঁহ একই হইল
হাস্য পরিহাস কতেক রঙ্গ
অনঙ্গ মাতিল রসের তরঙ্গ
দুজনে ঢলিল পালঙ্কে গা
স্বর্ণলালী ছন্দে করিছে বা
পথের শ্রম মনেতে জানি
উরুপরে ধরে চরণ দুখানি
দুজনে দেখিয়া আলসে ভোর
চরণ রাখিয়া উঠিলা মহুর
মহুরে আসিয়া দাঁড়াইল পাশে
দুজনা বিলাস সুখেরি আসে

তৃতীয় পদটী যুগল-মিলনের বর্ণনা। এই পদ দুইটীতে সেরূপ কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও কবিত্ব বর্জ্জিত নহে।

দেখ দেখ সখি নিকুঞ্জ কুটীরে
বিনোদ বিনোদী রঙ্গ
নবীন কিশোরী নবীন প্রেম
নবীন মদন সঙ্গ
আধশিরে শোভে বেণী ভুজঙ্গিনী
খেলিছে কতেক রঙ্গে
আধ শিরেতে ময়ূর নৃত্য করে
ময়ূরিণী করি সঙ্গে
আধ বদনে কমল প্রকাশ
আধ বদন চন্দ
ভ্রমরা চকোর আসিয়া মিলল
দোঁহে করে মহাদ্বন্দ
ভ্রমরা কহয়ে চাঁদের উদয়
চকোর কহিছে চন্দ
যাহার যেমন ভাবের উদয়
সে দেখে তেমন রঙ্গ
আধ গলায় মোতিম হার
দীপ্ত করিছে অঙ্গে
আধ গলাতে বিনোদ মালা
দুলিছে কতেক রঙ্গে
এক করেতে নীলমণি চুরি
এক করে শোভে বালা
দোঁহ অঙ্গ আধ আধ হইল
এ কি বিষম জ্বালা
আধ কাঁটাতে পীতবাস শোভে
নীল সাড়ী আধ বেড়া
নবীন তমালে জাম্বুনদ লতা
জাগুর উপরে জড়া
এক চরণে ঝুমকা বাজয়ে
যাবক অতি সাজে
এক চরণে সোণার নূপুর
রণ ঝুনু ঝুনু বাজে
দেখিয়া সখীর বিস্ময় হইল
রসবতী রসরাজে
ডালেতে বসিয়া শুক শারী দোঁহে
আনন্দে মগন গরজে
স্বর্ণলালী কয় রাই শ্যামের
প্রেম সুখ রস আশে
দোঁহার বিলাস দেখয়ে রঙ্গে
রসের তরঙ্গে ভাসে

রূপানুরাগ, অভিসার এবং মিলন পদের এইরূপ ক্রম পর্য্যায় দেখিয়া মনে হয়, স্বর্ণলালী পূর্ব্বরাগ প্রভৃতির পদও রচনা করিয়াছিলেন। উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে এমন কত কবির কবিতা নষ্ট হইয়া গেল, কত কবির নাম অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

স্ত্রীশিক্ষার সাধারণ প্রচলন না থাকিলেও পশ্চিমবঙ্গে সেকালে শিক্ষিতা মহিলার অসদ্ভাব ছিল না। কবীন্দ্র রমাপতির স্ত্রীর পরিচয় অনেকেই জানেন। বাঁকুড়ায় তাঁহার পিত্রালয় ছিল। স্বর্ণলালী বীরভূমের কবি। খুঁজিলে পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক কবির সন্ধান মিলিতে পারে। সেকালে অনেক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের পত্নী কন্যা ভগিনী অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে ছাত্রদের পাঠ দিতেন, পাঠ গ্রহণ করিতেন। পশ্চিমবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া হারাধন সুত্রধর তাঁহার পিতৃষসার নিকট জটিল তালমান ও আখরসহ পালাবন্দী কীর্ত্তনের গান শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সে দিনও তথাকথিতা ইতর জাতীয়া রমণী যজ্ঞেশ্বরী অকাবাই প্রভৃতি কবির দলের নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন। ইঁহাদের রচিত অনেক গান আজিও কবিওয়ালাদের এবং জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরিতেছে। দেশে প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধান ও আলোচনা এই সবে সুরু হইয়াছে মাত্র। দেশের তরুণের দলকে কি এদিকে মনোযোগ দানের অনুরোধ করিতে পারি?

সৌজন্যে www.milansagar.com

জলধর সেন সম্পাদিত, "ভারতবর্ষ" পত্রিকার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় (আগস্ট ১৯২৯) প্রকাশিত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলালী" প্রবন্ধ।